টেকসই উন্নয়নঃ বাংলাদেশের নারীশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

হান্নানা বেগম

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চলেছে। নারী দিনভর সংসারের যে কাজ করে জাতীয় আয়ে তার মূল্য সংযোজন করলে এখনই দেশটিকে মধ্যম আয়ের দেশ বলা যায়। এটি কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলে থাকেন। তবে আমাদের উন্নয়ন যাই হোক না কেন, তাকে যে আমরা টেকসই করতে চাই এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি টেকসই উন্নয়নের অবতারনা করছি এই জন্য যে, বিশ্ব এখন ধাবমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। এ গতিশীল বিশ্ব-অর্থনীতিতে যুতসইভাবে টিকে থাকতে হলে উন্নয়নকে টেকসই করতে হবে। অর্জিত উন্নয়ন যেন বিশ্বের যেকোন ঝড়ো হাওয়ায় কাত হয়ে না পড়ে। আর প্রবন্ধটি–নারী বিষয়ক হওয়ায় টেকসই উন্নয়নে নারীর অবস্থান কি সেটিও আমি দেখে নিতে চাই এবং সে কষ্ঠি পাথরে পরখ করতে চাই নারীর অবস্থান এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশে নারীর শিক্ষা। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী যদি অবধারিত না হয় তাহলে নারী শিক্ষা নিয়ে গবেষণা বা কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

গবেষকগণ বলছেন– বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু কাজটি গতি পাচ্ছে না। এগুচ্ছে না। উন্নয়ন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটি টেকসই হচ্ছে না। স্থায়ী হচ্ছে না। প্রশ্ন এসেছে, এখানে এমন কোন্ উপাদানের অভাব আছে যার ভূমিকার অভাবে এ কর্মযজ্ঞ স্থিতিশীলতা পাচ্ছে না? এ প্রশ্ন অর্থনীতিবিদদের, পরিবেশবিদদের, সমাজবিদদের। বড় সংখ্যক গবেষকের মত হলো, বিশ্বকে জেন্ডার অসমতার জন্য এ ধরনের বড় রকমের মূল্য দিতে হচ্ছে। ঘর থেকে শুরু হওয়া এ অসমতা থেকেই উদ্ভব হয়েছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক অসমতা ও পরিবেশগত অসমতা। আর এর ফলে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। মনে রাখার বিষয় টেকসই উন্নয়নের প্রাণকথা হলো– 'অর্থনৈতিক সমতা,' 'সামাজিক সমতা,' আর 'পরিবেশগত সমতা।'

Dr. Steven, Economist in the US Goverment, তাঁর গবেষণায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'Whether Gender Equality is the missing link of Sustainable Development'. বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা Sustainable Development Insights-এ তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা– "Are Women the key to Sustainable Development"? এই গবেষণায় গবেষকগণ বলছেন, কিছুদিন আগেই পুঁজিবাদি বিশ্ব ধাক্কা খেয়েছে, অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। যা বিশ্বের প্রায় সব দেশকে কমবেশি নাড়া দিয়েছে। এটি এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুষ প্রধান অর্থনীতির ভুলের কারণে হয়েছে। যদিওবা এই সময়কালে যারা ঘটনা ঘটিয়েছেন, ব্যাংকের পুরুষ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তারা ভারী বোনাস পেয়েছেন। আর নারীগণ মন্দার কারণে অধিকতর মন্দ সময় কাটিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, বিশ্ব অর্থনীতি গঠনে নারী-পুরুষের সম অবদান নেই। দুঃখজনক সত্য হলো, কোন কাজ প্রাতিষ্ঠানিক অথবা অপ্রতিষ্ঠানিক যাই হোক না কেন, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নারীর কাজকে কমবেশি খাটো করে দেখা হয়। নারীর প্রতি এ

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সত্য রূপ ধারণ করেছে, যা বিশ্বের জন্য মঙ্গলজনক নয়। ভেতরের কথা- নারীরা সন্তান প্রতিপালনে অধিকতর সময় দেওয়ায় তাঁরা বরাবরই সময়ের সংকটে ভোগে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশ্বময় নারীরা সন্তান প্রতিপালনে এবং গৃহ ব্যবস্থাপনায় সময় দেওয়ায় সময়ের সংকটে ভোগে। তাদের অনেকে চাকরি করতে পারে না। এ কারণে উপার্জনক্ষম কাজ করলেও তাঁরা মানসিক স্থিতি পায় না। এক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়েই বড় সমস্যা– কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী নারীদের শিশুদের নিরাপত্তা ও যত্নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। কিন্তু যেসব দেশ এটি করেছে, যেমন- ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স এবং আরও অনেক দেশে কর্মক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সরকারকর্তৃক বাধ্যতামূলক হওয়ায় সেখানকার নারীরা নিশ্চিন্তে চাকরি করছে এবং সেখানকার জন্ম হার জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের চেয়ে বেশি। নারীর জীবনকে ভারসাম্যময় করে এসব দেশ একইসাথে বর্তমান শ্রমশক্তি এবং ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তিতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে।

যদিও বিশ্বে কর্মক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু তারা এখনও অর্থনীতি বা রাজনীতিতে পুরুষের সমপর্যায়ে সময় দিতে পারছে না। চলমান এ বৈষম্য আরও বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। বিশ্বের কোন কোন দেশ এবং আমাদের বাংলাদেশ কোটা প্রথা প্রচলন করেছে। এতে অবস্থার সামান্য উন্নয়ন ঘটেছে। নরওয়ের কর্পোরেট বোর্ড কমপক্ষে শতকরা ৪০ জন নারী অন্তর্ভুক্ত করেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। ফলত বিশ্বের মধ্যে ওখানে নারী পরিচালকেরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফ্রান্স সরকার সম্প্রতি নিয়ম করেছে যে কোন কোম্পানির বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৫০ জন নারী হতে হবে।

জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংক তাদের গবেষণায় বলছে, যেসব দেশে অর্থনীতিতে নারীকে তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের চেয়ে জেন্ডার নিরপেক্ষ দেশের স্থিতিশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। নারী সবসময় দারিদ্র্য দূর করতে চায়। কারণ তারা সবসময় এ লক্ষ্যে নিজ পরিবার পরিচালনা করে। বিশ্বব্যাংক সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য- "Gender Equality as Smart Economics" নামে নিউজলেটার প্রকাশ করে। যেখানে তারা এ মত দিতে চেষ্টা করেন যে, অধিকতর উন্নয়নের খাতিরে নারীকে বিশেষ সুযোগ দিতে হবে। নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করলে তা অর্থনীতিতে গুণক ফলাফল দেয়। ব্যাংক এবং দাতা সংস্থাদের নারীকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেখানোর চেষ্টা নিতে হবে। নারীকে তাদের ঘরোয়া কাজ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষির মতো ধীরগতি সম্পন্ন কাজ থেকে সরিয়ে ভূমি, শ্রম, উৎপাদন ইত্যাদি খাতের মতো ক্ষমতা – সম্পন্ন বিষয়ে যুক্ত করতে হবে। যাতে তারা অর্থনীতি, সমাজনীতি ও পরিবেশনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশকেও তার টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীকে যথাযথভাবে কর্ম উপযোগী সামর্থ্যসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। আর তার মূল ভিত্তি হচ্ছে নোবেল বিজয়ী *অমর্ত্য সেনের* 'সক্ষমতার শিক্ষা'। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মুক্তিযুদ্ধ

পরবর্তীকালে যেই সরকারই আসুক না কেন প্রত্যেকেই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার মনোভব প্রদর্শন করেছে। তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়- মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ যুদ্ধ পরবর্তীকালের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রায় প্রতিটি সম্মেলন কিংবা আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, সিডও দলিল এবং বেইজিং ১৫-এ সাক্ষর করা। বাংলাদেশ বার বার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, জাতিসংঘের মূল শ্লোগান জেন্ডার সমতা অর্জনে । নারীকে অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসায়। ফলত নারীর শিক্ষা, নারীর কর্মজীবন নিয়ে পিছিয়ে থাকার সুযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় একটা ইতিবাচক আবহ বরাবরই ছিল। এছাড়া নারীর অন্তর্নিহিত যে শক্তি তা বরাবরই নারীকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো আমাদের কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা। তারা কি পড়াচ্ছেন তাই আমাদের জানা নেই। এছাড়া মাদ্রাসা থেকে যেসমস্ত মেয়েরা পাশ করছে তারা কি ধরনের কর্মসংস্থানে নিয়োগ পাচ্ছে এ বিষয়ে কোন গবেষণাও আমরা পাইনি। এ বিষয়ক গবেষণা একান্ত জরুরি।

মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্রী উপবৃত্তি এদেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছে। বরাবর সামনে এগিয়েছে নারী। একইভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কারণে এদেশের গার্মেন্টস শিল্পের প্রতিষ্ঠা নারীকে দু'কলম পড়ালেখা শিখানোর ব্যাপারে সাধারণ জনগণকে আগ্রহী করে তুলেছে। তবে নারী শিক্ষা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন এর পথে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যথেষ্ট। সরকারকে, সচেতন জনগণকে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে। অন্যথায় এই শেষের পথ পার হওয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো যতো সহজ, তার মান বারানো ততই কঠিন। এছাড়া রয়েছে গ্রাম শহরের সুবিধাগত পার্থক্য। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী গ্রামে থাকে। দেশে রয়েছে ধনী গরীবের সুবিধগত বৈষম্য, বন্টনের বৈষম্য। শুধু আর্থিক বৃত্তি দিয়ে, স্কুলে খাবার দিয়ে শিক্ষার শতকরা হার অর্জন বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এটি সামাজিক ও অর্থনীতির আন্তসম্পর্কিত গোলাকার চক্র (Vicious Circle)। একটি সম্পর্ক অন্যটিকে টেনে নামায় বা উর্দ্ধমুখী করে। কিছুদিন আগেও পর্যন্ত নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল অভিভাবদের অনীহা। শিক্ষার প্রতি অনাস্থা। এখন আত্মনির্ভরশীল নারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গরিব অভিভাবকগণ চান তাঁদের মেয়েরাও কিছুটা পড়ালেখা শিখুক।

এবারকার বাজেট ২০১৩-১৪ তে বাল্যবিবাহ রোধে বক্তব্য রয়েছে। বক্তব্যটি এই ধরণের "বাল্যবিবাহ রোধে আমাদের ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ অনেক জায়গায় নানা উদ্যোগে সহায়তা বা পৃষ্টপোষকতা দিচ্ছেন"। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় ইউনিসেফের বিশ্বশিশু পরিস্থিতি-২০১১ শীর্ষক প্রতিবেদনে বিশ্বে বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তিন জন কিশোরীর মধ্যে দুজনেরই বিয়ে হয়ে যায় তাদের বয়স ১৮-এর নিচে থাকতেই। আবার ১০ জনের মধ্যে তিন জনের বিয়ে হয় ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩৯ লাখ। কিশোরীদের মধ্যে প্রতি তিন জনে একজন অল্প বয়সেই মা হন। দেশের শতকরা ৯০ জন অভিভাবকই তাদের কন্যাসন্তানকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে চান। অর্থনৈতিক, সামাজিক, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, কু-সংস্কারসহ নানা কারণে মেয়েকে পাত্রস্থ করে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে চান তাঁরা। এতে কম বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর

উচ্চহার এবং অপুষ্ট শিশু জন্ম দেয়ার ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাল্যবিয়ে রোধ করা যাচ্ছে না। এ-সক্রান্ত আইনও খুব দুর্বল। বাল্যবিয়ে দিলে তার শাস্তি এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে ১৯৮৪ সালের এ-সক্রান্ত আইনে। বাংলাদেশ এমনিতেই জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত। এ অবস্থায় বাল্যবিয়ে রোধ করতে না পারলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। এই লক্ষ্যে এ-সক্রান্ত আইন যুগোপযোগী ও কঠোর করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও বাড়াতে হবে। বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনে আরও কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা।

আমাদের মনে রাখতে হবে এখন বাল্য বিয়ের প্রধান কারণ স্কুলে যাতায়তের পথে এবং নিজ ঘরে ছাত্রীদের অনিরাপত্তা। আমরা দেখেছি মেয়েকে স্কুলে নেওয়ার পথে মা জীবন হারিয়েছেন, শিক্ষক জীবন দিয়েছেন। অসংখ্য কিশোরী আত্মহত্যা করছে। শিক্ষা মন্ত্রী ছুটে যাচ্ছেন। হাইকোর্ট শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি বন্ধ করার জন্য নতুন আদেশ জারি করেছে। মনে রাখার বিষয়, আইন অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আইনের প্রয়োগ অবশ্যই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এই সমস্যা অনেক গভীরে নিহিত, স্থানীয় সরকারের খবরদারির অনুপস্থিতি অন্যতম প্রধান কারণ। ঘরে মায়ের অনুপস্থিতি তাও একটি কারণ। পাড়ায় খেলার মাঠ নেই। ক্লাব নেই। অতএব উদ্দেশ্যহারা তরুণদের সহজ বিনোদন মেয়েদের পেছনে বিশ্রীরকমভাবে ছোটা। এছাড়া এদেশের হাজার তরুণ দেখছে নারীকে জনসমক্ষে ফতোয়া দানকারীরা দোর্‌রা মারছে। এ দৃশ্য পত্রিকায় ছাপছে, টিভিতে দেখা যাচ্ছে। প্রশাসন দায়সারা গোছের সাড়া দিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো অতি সন্তর্পণে এই অবিচার দেখেও দেখছে না। অবশেষে অভিমানী পথহারা বালিকা আত্মহত্যা করছে। এসব বিষয় তরুণদের আইন অমান্য করার উৎসাহ যোগায়। তারা বিকৃত চিন্তার অধিকারী হয়।

স্কুলগুলোতে পাঠাগারের অভাব রয়েছে। পাঠাগার যদিও থাকে, লাইব্রেরিয়ান নেই। বর্তমান সরকার প্রাইভেট শিক্ষাদান বন্ধ করার জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এর সাথে শিক্ষকের বেতনের সম্পর্ক রয়েছে। স্কুলভিত্তিক এসেসমেন্ট যা বর্তমানে শুরু হয়েছে এক্ষেত্রে এটি যথাযথ পদক্ষেপ। স্কুলের একাডেমিক সুপারভিশন আরও জোরদার করা দরকার। বেসরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থাপনার কমিটি শক্তিশালী করে কমিউনিটি মোবিলাইজ করতে হবে। এস. এম. সি'র প্রশিক্ষনের প্রয়োজন রয়েছে। এসব কমিটিতে জাতীয় সংসদ সদস্য, আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব বন্ধ করা প্রয়োজন। কমিটির সদস্যগণ হবেন অভিভাবক এবং সমাজের নির্দিষ্ট বিষয়ে অবদান রাখার মতো পরিচিত ও যোগ্য ব্যাক্তিত্ব। স্কুলের পারফরমেন্স ও অনুদানের মধ্যের সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বক্তৃতা পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ক্লাসে শিক্ষক সঞ্চালনকারী প্রাণ পুরুষ। যিনি ক্লাসকে প্রাণ দেবেন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবেন। ছাত্রদের মেধা, ধী শক্তির প্রতি শিক্ষকদের সম্মানবোধ থাকা প্রয়োজন।

আমাদের শিশুরা, তরুণরা কি পড়ছে, সেটিও আমাদের দেখা দরকার। শিক্ষার মূলাধার হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম। এ কারিকুলামের নির্যাসে তৈরি হয় পাঠ্যপুস্তক। আর এই পাঠ্যপুস্তক আগামী জাতি গঠনের মনোবিকাশপত্র। পাঠ্যপুস্তকের নির্যাস আদলে শিশু আপন অজান্তে নিজকে গড়ে তোলে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। এসব অন্তর্নিহিত কারণে কারিকুলামবিদ, সিলেবাসকারী, লেখক, গ্রন্থ পরীক্ষক সর্বোপরি শিক্ষক এঁদের জেন্ডার সমতা সম্পর্কে এবং গতিময় বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে তাঁদের এ বহুমুখী জ্ঞানের বিশেষত জেন্ডার সমতা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষনের জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই। ফলত নারী শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য এবং টেকসই উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা এখনও প্রতি পদে অবহেলিত হচ্ছে যার প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়নকারী সংস্থা হচ্ছে ন্যশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড। এই সংস্থার দায়িত্ব, কারিকুলাম প্রণয়ন করা। সরকারি চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় আমার এই সংস্থায় মেম্বার কারিকুলাম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে এই বিষয়গুলো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। চেষ্টা করেছি কারিকুলামবিদ, লেখক, পুস্তকপরীবিক্ষণকারীদের বরাদ্দ না থাকা সত্বেও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য। কারিকুলাম পরিবর্তন সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়-সাপেক্ষ বিষয়। এসব সংস্থার কর্তা ব্যক্তিগণের দীর্ঘকালীন সময় একই পদে অবস্থান করার সুযোগ কম হয়। ফলত কর্মকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু সংস্থা, দেশ বা ছাত্রসমাজ পায় না। এ সংস্থার মধ্যস্তরের কর্মকর্তাগণ মাঝেমধ্যে কারিকুলাম বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। কিন্তু প্রমোশনের পর তাদের বদলি করা হয়। আবার নতুন কর্মকর্তা বহাল হন। নতুন যিনি আসেন তাঁর পক্ষে হঠাৎ করে কারিকুলামবিদ হয়ে ওঠা কঠিন হয়।

অতএব অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ করে গড়ে তোলার স্বার্থে, আমাদের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে, কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে সার্বিকভাবে কারিকুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণে আরো অধিকতর মনোনিবেশ করতে হবে।

লেখক পরিচিতিঃ প্রফেসর হান্নান বেগম, পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক। সাবেক অধ্যক্ষ ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।

তথ্যসূত্র :

1. Stevens, Candice, Are Women the key to Sustainable Development?, Boston University.
২. বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ২০১৩–১৪